Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 15-20
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.003

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ও ব্যাবহারিক জীবন

প্রিয়াঙ্কা গরাঁই, *গবেষক, বেদান্ত বিভাগ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পুরী, ওড়িশা, ভারত*

Received: 09.06.2025; Accepted: 04.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The living entity has a practical existence but no spiritual existence. In spiritual existence, the living entity is Brahman. Under the influence of Maya, the qualified Brahman manifests itself as a living entity. But the Supreme Soul is one, the Vibhu, the Sachchidananda. This living entity is created by Maya or ignorance or avidya, so it considers itself separate from Brahman. When this avidya or ignorance is removed, the distinction between the living entity and Brahman disappears and unity between the living entity and Brahman is achieved. True knowledge is subject to the intellect, not to the object, but the knowledge of the truth is subject to the object. Knowledge of the truth is knowledge of the truth as it is. In Advaita, Brahman is eternal, and the world is impermanent. Only Brahman has a spiritual existence and it is possible to gain the knowledge of Brahman with the help of Paravidya. This knowledge is neutral knowledge that can be experienced. The intellect of judgment is a way of experiencing this neutral knowledge.

Keywords: Spiritual existenc, Sachchidananda, Supreme Soul, Brahman disappears knowledge

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সত্যের পিছনে ছুটে চলেছে, সত্যের সন্ধানে। এই সত্যের অন্বেষনের জন্য তার্কিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক মার্গকেই বেছে নিয়েছে। এই সব মার্গগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গই হল শ্রেষ্ঠ মার্গ। আধ্যাত্মিক মার্গ হল দর্শনের অংশ। ভারতীয় চিন্তায় দর্শন হল মুনি ঋষিদের সাধনায় প্রাপ্ত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দর্শন কেবল তত্ত্ব আলোচনাই নয়, সত্যের সন্ধান ও উপলব্ধির পাশাপাশি জীবনের সত্যের প্রতিষ্ঠাও করে। এই দর্শনের একটি ধারা হল বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন ও আধ্যাত্মিক মার্গ একে অপরের পরিপূরক। বেদান্ত দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হল অদ্বৈতবেদান্ত। এই অদ্বৈতবেদান্তের প্রাণপুরুষ হলেন শঙ্করাচার্য। এনাকে ছাড়া অদ্বৈতবেদান্ত অচল। প্রস্থানত্রয়ী ও অদ্বৈতবেদান্তের বিভিন্ন প্রকরণ গ্রন্থে সত্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে আধ্যাত্মিক মার্গের মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক মার্গকে জানতে হলে সর্বাগ্রে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হবে।শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের স্বরূপে বলেছেন-

> "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
> অনেন বেদ্যং সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।।"[১]

অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থ যে সত্য প্রতিপাদন করেছে, তা শঙ্করাচার্য এই শ্লোকেই ব্যক্ত করেছেন- ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অদ্বৈতবাদে জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মে লীন করে

[১] শ্রীশঙ্করাচার্য, ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা, শ্লোক সংখ্যা- ২০
https://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_shankara/brahmajna.html

একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলা হয়েছে। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগৎপ্রপঞ্চ স্ব স্ব কারণে ব্রহ্মে লীন হয়ে ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। যেহেতু অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সেহেতু জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম হলেন চৈতন্যস্বরূপ।

প্রশ্ন হল, অদ্বৈতমতানুসারে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত সত্তার অধিকারী। কিন্তু জীব তো সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত সত্তাবিশিষ্ট নয়। তাহলে জীব ও ব্রহ্মকে কিভাবে এক ও অভিন্ন বলা যাবে? উত্তরে বলা হয়েছে, জীবও ব্রহ্মের মতোই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অর্থাৎ আগুন এবং আগুনের একটা ফুলকি যে অর্থে এক, জীব ও ব্রহ্ম সেই অর্থেই এক বা অভিন্ন। কিন্তু জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা আমারা উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং বিষয়-বাসনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে জীবের জ্ঞান, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লোপ পায়। সংসারদশায় অবিদ্যা জীবের ব্রহ্মভাবকে আবৃত করে রাখে। এই অবিদ্যা মলিনসত্ত্বপ্রধান ব্যষ্টি-অবিদ্যা। তার ফলে জীব নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হলেও অবিদ্যাবশত অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় এবং দেহাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করে। জীবের এই ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মরণ ও দেহাদির সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে জীবের 'অহং বোধ' জন্মায়। জীব তখন নিজেকে সকল বস্তু থেকে পৃথক করে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন, সসীম সত্তার অধিকারী মনে করে। এই পরিচ্ছিন্ন জীবই হল বদ্ধ জীব। এই বদ্ধ জীব নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলেও মনে করে।

শঙ্করাচার্যের মতে, জীব হলো আত্মা ও অনাত্মার মিশ্রণ। শুদ্ধ আত্মায় অনাত্মার অধ্যাসের ফলে অর্থাৎ, যখন আত্মার উপর অনাত্মা আরোপিত হয়, তখনই শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মা জীবে পরিণত হয়। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি হলো অনাত্মা। যখন সাক্ষী-চৈতন্যের সঙ্গে অন্তঃকরণ যুক্ত হয় তখন ভ্রান্তিবশত আত্মা-অনাত্মার ভেদ বোধ হয়। আর তখনই অহং-রূপ জীবত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন আমরা বলি- 'আমি রোগা' বা 'আমি মোটা', 'আমি অন্ধ' বা 'আমি খোঁড়া', 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি। আত্মার উপর অনাত্মার আরোপের ফলেই জীব দুঃখ ভোগ করে। আত্মা কিন্তু রোগা, মোটা, অন্ধ, খোঁড়া, সুখী, দুঃখী- এসব কিছুই নয়। চৈতন্য মায়ার দ্বারা উপহিত হলেই এইরকম ভেদ বোধ জন্মায়। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বর, জীব ও জাগতিক বিষয় সবই মিথ্যা, ব্রহ্মের বিক্ষেপমাত্র। এ প্রেক্ষিতে অদ্বৈতবেদান্তের আধুনিক প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

> "অদ্বৈতবাদীদের কাছে জীবাত্মার কোন স্থান নেই। তাহাদের মতে জীবাত্মা মায়ার সৃষ্টি; আসলে জীবাত্মার কোন (পৃথক) অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।"[২]

অদ্বৈতমতে জীবের ত্রিবিধ অবস্থা:

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের উপলব্ধ বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে অদ্বৈতবেদান্ত জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছে। জীবের চার প্রকার অবস্থা আছে- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীব জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি- এই তিনটি অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। জাগ্রত অবস্থা সম্পর্কে মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে-

> "জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বনরঃ প্রথমঃ পাদঃ।।"[৩]

অর্থাৎ জীব যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে, তখন সব ইন্দ্রিয়ই সজাগ অর্থাৎ আত্মা তখন বাইরের বিষয়-জ্ঞানে মত্ত। বাইরের বিষয় বলতে- শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ। জীব এগুলি থেকেই জ্ঞানসঞ্চয় করে। জ্ঞানই হলো আত্মার খাদ্য। আত্মা তখন সাতটি অঙ্গ, আর উনিশটি মুখ দিয়ে বিশ্বের যাবতীয় স্থূল পদার্থ অনুভব করেন ও ভোগ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, কোনকিছুই এর বাইরে নয়। তাই জীব যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান নিয়ে আত্মা হন বৈশ্বানর। আত্মার এটি হল প্রথম পাদ বা অবস্থা। স্বপ্নাবস্থা সম্পর্কে মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে-

> "স্বপ্নস্থানো অন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।"[৪]

---

[২]স্বামী জ্ঞানাত্মনন্দ প্রকাশিত স্বামীজীর বাণী ও রচনা ২য় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৪৭

[৩] ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্- ১/৩, পৃষ্ঠা- ৫৬৬

[৪]ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্- ১/৪, পৃষ্ঠা- ৫৬৮

অর্থাৎ আত্মার দ্বিতীয় পাদ বা স্বপ্নময় অবস্থাটি হলো তৈজস। জাগ্রত অবস্থাটি জীবাত্মার বোধের জগৎ, অন্যদিকে স্বপ্নাবস্থাটি স্বসৃষ্ট মায়ার জগৎ। কারণ জাগ্রত অবস্থায় জীব যা কিছু দেখে, যা কিছু অনুভব করে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে স্বপ্নে। তবে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে জীব তখন থাকে অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত। বাইরের জগৎ তখন তাঁর পুষ্টিসাধন করে না, খোরাক যোগায় অন্তর্জগৎ। তাই তৈজস আত্মাকে বলা হয় প্রবিবিক্তভুক্ অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্তুকে আশ্রয় করে আত্মা তখন অন্তরে থেকে অন্তরপ্রজ্ঞ- অন্তর জগতের জ্ঞানে জ্ঞানী হন। মানুষ কতো না কামনা-বাসনা-কল্পনা নিয়ে দিন কাটায়। যার হয়তো অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ ভোগ সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই ঘুমন্ত অবস্থায় সেগুলো স্বপ্নজগতে ভেসে ওঠে। তখন এই সাত অঙ্গ, উনিশ মুখ বাইরে যদিও ঘুমোচ্ছে, ভেতরে কিন্তু সক্রিয়ভাবে থেকে সেগুলিকে উপভোগ করছে। স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা ছাড়াও জীবাত্মার আরেকটি অবস্থা হলো সুষুপ্তি। এটা কী? স্বপ্নহীন নিদ্রাকে 'সুষুপ্তি' বলে। এই সুষুপ্তির লক্ষণ ব্যাখ্যাকল্পে মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে-

> "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুকেচতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।"[৫]

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যখন কোন কামনা-বাসনা থাকে না, ঘুমন্ত অবস্থায় কোন স্বপ্ন না দেখে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন ঘুমের মধ্যে ডুবে থাকে, তখন সেই ঘুমন্ত অবস্থাকে বলে সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তির মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, সব বিষয়ের জ্ঞান একসঙ্গে মিশে গিয়ে ঘন এক হয়ে যায়, আনন্দঘন- জ্ঞান এবং আনন্দকে উপভোগ করে আত্মা প্রাজ্ঞ হয়ে যান। এই প্রাজ্ঞ আত্মাই হল তাঁর তৃতীয় পাদ বা অবস্থা। আত্মার তৃতীয় অবস্থা হলো প্রাজ্ঞ, চেতনমুখ। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মা এই আনন্দকে আশ্রয় করেই আনন্দময় হয়ে থাকেন। তৃতীয় ক্ষেত্রে এই যে প্রাজ্ঞ-আত্মা, ইনিই হলেন সর্বেশ্বর, নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী। যেমন বাইরের জগতে ইনি আছেন, তেমনি দেহ-জগতের ভেতরেও আছেন। যাবতীয় বস্তুর ইনিই যেমন উৎপত্তিস্থল, তেমনিই আবার লয়স্থান। সুষুপ্তির লক্ষণে ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে-

> "তদাত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।।"[৬]

অর্থাৎ কোন মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে যায়, কোন কাজ করে না। সেই ব্যক্তির কোন দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা কিছুই আর থাকে না। তখন স্বপ্নও দেখে না। ইন্দ্রিয়গুলি তখন নাড়ীতে প্রবেশ করে। তখন সূর্যরশ্মি তাকে ঘিরে থাকায় কোন পাপই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

জীবের অন্য অবস্থাটি হল- তুরীয়াবস্থা। তুরীয়াবস্থা সম্পর্কে মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে-

> "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
> অদৃষ্টমব্যক্তবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" [৭]

অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে যে অবস্থা মৃত্যু, সাধকের কাছে সে অবস্থা হল তুরীয় অবস্থা। এই তুরীয় অবস্থাতেই সাধকের সমাধি। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে সব এক হয়ে যায়। আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। 'আমি'-'তুমি'-'সে'-এসবের কোনো বালাই নেই। সাধকের একটাই অনুভূতি, একটাই পরিচয়- "অহং ব্রহ্মাস্মি"। কিন্তু এই যে অদ্বৈত আত্মা, বিশাল অখণ্ড সত্তা, এর স্বরূপ কী? আত্মার আগের যে রূপ- অন্তঃপ্রজ্ঞ, বহিঃপ্রজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন- এসবের কিছুই সেখানে নেই। তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়। তাঁর না আছে কোন বিশেষণ, না আছে কোনো গুণ। জীবের এই চার অবস্থার মধ্যে তুরীয়াবস্থাই হল শ্রেষ্ঠাবস্থা।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীকের কোন সত্তা স্বীকার করা হয় না। অলীক নিঃস্বভাব অসৎ। অসৎ কখনো ভাবরূপকে প্রকাশিত করে না। কিন্তু যা কিছু ভাবরূপে প্রকাশিত হয়, তা কিন্তু সমানসত্তাবিশিষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য তিনপ্রকার সত্তা স্বীকার করেছেন- পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। ব্রহ্ম বিষয়ে

---

[৫] ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্- ১/৫, পৃষ্ঠা- ৫৭১

[৬] ছান্দোগ্যোপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩, ছান্দোগ্যোপনিষদ্- ৮/৬/৩, পৃষ্ঠা- ৮৫৭

[৭] ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩ , মাণ্ডুক্যোপনিষদ্- ১/৭, পৃষ্ঠা- ৫৮০

সাক্ষাৎ উপলব্ধি হলে যার সত্যতা জানা যায়, সেই পদার্থ পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৎ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিভু, নিত্য ও যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ-সত্তারূপে ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ। অপরদিকে ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পদার্থ সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তা হল ব্যবহারিক সত্তা। অর্থাৎ, প্রতীয়মান সকল বস্তুই সেই বস্তুরূপে ব্যবহারিক সৎ। আর ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হল প্রাতিভাসিক সত্তা।

অদ্বৈতমতে একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নেই। শুক্তিতে যখন রজতের ভ্রম হয়, তখন রজতের সত্তাটি প্রাতিভাসিক। আবার যখন রজতের যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন রজতের সত্তাটি ব্যবহারিক। কোনো বিষয় না থাকলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না। যেমন আকাশকুসুমের জ্ঞান হয় না। কারণ আকাশকুসুম বলে কিছুই নেই। কিন্তু প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান আমাদের হয়। সুতরাং, প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক দুটি জগৎ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র ব্রহ্মই সত্য হয়, তাহলে প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান কিভাবে হয়? উত্তরে শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী অদ্বৈতবাদীরা বলেন, প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক জগৎ হলো মায়া বা অবিদ্যার রূপান্তর। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার ভেদ হল যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা ও ভ্রমের ভেদ। অবিদ্যা বা মায়ার দ্বারাই ব্যবহারিক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। শুক্তিকে যখন শুক্তিরূপে জানা হয়, তখন শুক্তির ব্যবহারিক সত্তা সমষ্টিগতভাবে স্বীকার করা হয় অর্থাৎ ঐ সত্তা অন্যেরাও স্বীকার করেন। কিন্তু শুক্তিকে যখন রজতরূপে জানা হয়, তখন রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা সমষ্টিগতভাবে স্বীকৃত হয় না। শুক্তিতে রজতের প্রতিভাস রজতের সত্তা অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছেই স্বীকৃত হয়। শুক্তিতে যখন রজতের ভ্রম হয়, তখন সেই রজতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। একমাত্র শুক্তির বা মিথ্যা রজতের অধিষ্ঠানটির অস্তিত্ব থাকে। এক্ষেত্রে রজতটি হল শুক্তির প্রতিভাসমাত্র, বা বিবর্ত। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। আমাদের মায়া বা অবিদ্যার কারণে জগতের প্রকৃত অধিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান হয় না, শুধুমাত্র জগৎ প্রপঞ্চকেই জানতে পারি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ হল ব্রহ্মের বির্বতমাত্র। মায়ার দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি কর্তা বা জগতরূপ বির্বতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরেরে কার্য হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা। কারন ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগৎ কোন কালেই নেই। অজ্ঞানতার জন্য শুক্তি যেমন রজতরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি মায়া বা অবিদ্যা হেতু ব্রহ্মই জগৎ অনুভবের হেতু হন। মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্ম থেকে আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চপ্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, পঞ্চভূত ও যাবতীয় স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়।

শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ মিথ্যা:

ব্রহ্ম যে অর্থে সৎ, জগৎ সেই অর্থে সৎ নয়। আবার আকাশ কুসুম যে অর্থে অসৎ সেই অর্থে জগৎ অসৎ নয়। জগৎ এই সৎ ও অসৎ থেকে ভিন্ন, কিন্তু মিথ্যা কারণ শুদ্ধ চৈতন্যরূপ, সৎ ব্রহ্ম অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলেই জগৎ বাধিত হয় বলে মিথ্যা। কিন্তু জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় ততক্ষণই। জগৎ যথার্থ সৎ নয়, ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ যে মিথ্যা তার অনুভব হয়। ‘বৃহ্’ ধাতুর উত্তর ‘মন্’ প্রত্যয় যোগ করে ব্রহ্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। বৃহ ধাতুর অর্থ বড় বা ব্যাপক এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়। সুতরাং ধাতুগত অর্থে ব্রহ্ম হলেন, যাঁর থেকে অতিশয় ব্যাপক বা বৃহত্তম আর কিছুই নেই।

ভারতীয় দর্শনের রীতি অনুসারে ব্রহ্মের দুপ্রকার লক্ষণ- তটস্থ লক্ষণ এবং স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ কোন তত্ত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় স্বরূপ লক্ষণ। আর যে লক্ষণ তত্ত্বের আপাত রূপকে প্রকাশ করে, সেই লক্ষণকে বলা হয় তটস্থ লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন ব্যক্তি যখন স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয় করেন, তখন ঐ ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় যা, তা হলো তার স্বরূপ লক্ষণ। কিন্তু অভিনয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় তার তটস্থ পরিচয়। এই তটস্থ লক্ষণ প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে-

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জানাতি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্মেতি।"[৮]

অর্থাৎ, যেখান থেকে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, যার আশ্রয়ে সমস্ত জীব জন্মের পর বেঁচে থাকে এবং যার মধ্যে লীন হয়ে যায় তিনিই ব্রহ্ম। অতএব, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে-

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"[৯]

অর্থাৎ, ব্রহ্ম হলেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। ব্রহ্মের এই তিনটি গুণ একত্রিত হয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত করে। তাছাড়াও ব্রহ্ম হলেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। সৎ শব্দের দ্বারা অস্তিত্ব, চিৎ শব্দের দ্বারা চৈতন্য বা জ্ঞান, এবং আনন্দ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে ঐশ্বরীক আনন্দের অনুভূতিকে বোঝানো হয়েছে। এই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্মের সঙ্গে সৎ, চিৎ ও আনন্দের কোন বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্ক নেই। এগুলি হল ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ, এগুলির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা হয়। এই তিনটি পদের দ্বারা ব্রহ্মকে কখনোই বিশেষিত করা হয় না। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ অর্থাৎ অসৎ বা অস্তিত্বহীন নয়। এখানে সৎ বা অস্তিত্বের অর্থ হলো যা কোনদিন লয় হয় না। ব্রহ্ম অভাব পদার্থ নয়। কারণ অভাব থেকে কখনও ভাবের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং, ব্রহ্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। সুতরাং, ব্রহ্ম সর্বকালে প্রকাশিত। ঘট, পট ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার জন্য চৈতন্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যিনি 'চৈতন্যস্বরূপ' তিনি কখনই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করেন না। যেমন সূর্যকে দেখার জন্য প্রদীপের সাহায্য লাগে না। সুতরাং, ব্রহ্ম কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারেন না। তিনি জ্ঞানমাত্র। ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত, তাই তিনি আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ- এর অর্থ ব্রহ্ম আনন্দাভাব বা দুঃখস্বভাব নন।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ:

শঙ্করাচার্যের মতে পারমার্থিক দিক থেকে জীব ব্রহ্মস্বরূপ। নিগুণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তাই ব্রহ্ম থেকে পৃথক জীব বলে কিছু নেই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন। অবিদ্যাবশত জীব যে ব্রহ্ম স্বরূপ তা সে বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা বলে মনে করে। সেজন্য জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হলেও ব্রহ্মের বিবর্ত বা কার্যরূপে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক যেমন মায়ার সাথে, এবং বাস্তবতার সাথে আবির্ভাবের সম্পর্কও তেমনই ব্যাখ্যাতীত। যতক্ষণ জীবের মধ্যে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতার ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান থাকে এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি আবদ্ধতা থাকে, ততক্ষণ জীব ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে এবং জন্ম ও মৃত্যুর সংসারচক্রে আবদ্ধ থাকে। একবারের জন্য যদি এই কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব বাদ দেওয়া হয়, তাহলে জীব যে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন তা উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা হল জীবের ভিত্তি। এটি নিজেই জীবের অজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অজ্ঞতা বা অজ্ঞান হল মনের যা মানসিক অবস্থার ফল। মনের এই অবস্থা হল আয়নার উপরে জমা হওয়া ময়লার স্তরের মতো, যাতে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি ঝাপসা হয়ে যায়। আয়না পারিষ্কার করে ময়লা অপসারণ করা হলে, প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখা যায়। তেমনি মন শুদ্ধ হলে আত্মাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করে। এইভাবে, যখন সীমাবদ্ধ অবস্থাগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন জীব তার উৎস, ব্রহ্মের দিকে ফিরে যায়, যা অনন্তকালের আলো।

তথ্যসূত্র:

[৮]ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্- ৩/১/১, পৃষ্ঠা- ১০৭৩

[৯] ঈশাদি নৌ উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩ , তৈত্তিরীয়োপনিষদ্- ২/১/১, পৃষ্ঠা- ৯৬৫

১. বেদান্তবাগীশ কালিবর সম্পাদিত। বেদান্তসার। সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
২. ধীবর, কৃষ্ণ, সম্পাদিত। বেদান্তসার। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০২১
৩. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (২য় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। কলকাতা, ২০১২
৪. ছান্দোগ্যোপনিষদ্। গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩
৫. মাণ্ডুক্যোপনিষদ্। গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩
৬. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১১
৭. ঈশাদি নৌ উপনিষদ্। গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ২০১৩
৮. ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র, সম্পাদিত। বেদান্তপরিভাষা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৪
৯. পুরী, স্বামী চিদ্ঘনানন্দ সম্পাদিত। বেদান্তদর্শনম্ প্রথম অধ্যায়। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৯
১০. পুরী, স্বামী চিদ্ঘনানন্দ, সম্পাদিত। বেদান্তদর্শনম্ দ্বিতীয় অধ্যায়। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৯